ঝাড়গ্রাম

(শতপর্ণীতে প্রকাশিত)

১।

কোলকাতা থেকে ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে শাল-মহুয়া আর লালমাটি-কাঁকড়ের দেশ ঝাড়গ্রাম। মেদিনীপুর জেলার মহকুমা শহর। যাব যাব করে যাওয়া হয়নি অনেকদিন ধরে। শতপর্ণীর সম্পাদক বিপ্রদাস ভট্টাচার্য এক সাহিত্যবাসরে ঝাড়গ্রাম যাওয়ার প্রস্তাব পেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলাম সুযোগটা।

প্রথমে জনা দশবারো সদস্য জুটে যাবে মনে হয়েছিল। পরে পাঁচ-ছ'জনের বেশি সদস্য হচ্ছিল না দেখে গৌতম সরকারকে বলি – যাবে নাকি ঝাড়গ্রাম দিন তিনেকের জন্য?

গৌতম জানাল ভাইঝি মধুলীনাকে নিয়ে ওরা দুজন যেতে রাজি। প্রফেসার জগদীন্দ্র মণ্ডল স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে যাবেন। অভাবিতভাবে স্বাতী ভট্টাচার্য পুত্র পাপ্পুকে নিয়ে যেতে তৈরী হয়ে গেল। সংখ্যায় আমরা মোট দশজন হলাম। তার মধ্যে আটজন শতপর্ণীর সদস্য-পরিবার এবং দুজন বহিরাগত।

২৮শে ডিসেম্বর,২০০৩, রোববার। ভোর থেকে অবেলার ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছে। হিমেল বাতাসে কনকনে ঠাণ্ডা। সবকিছু উপে(া করে হাওড়া পৌঁছতে উৎসাহের অভাব হল না। সকাল ৬-৩৫ মিনিটের ইস্পাত এক্সপ্রেস ধরে ঝাড়গ্রাম। হাওড়া থেকে দূরত্ব ১৫৫ কিমি এবং খড়্গপুর থেকে ৪০ কিমি। সড়কপথে জাতীয় সড়ক-৬ ধরে যেতে হবে ২৪৬ কিলোমিটার দূরের লোধাশুলি। সেখান থেকে ডানহাতে ঝাড়গ্রাম মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে। আমাদের সময় লাগল তিন ঘন্টার মতো।

ঝাড়খণ্ডের লাগোয়া ছোট্ট শহর ঝাড়গ্রাম। জল হাওয়ার টানে পর্যটক আসে শীতের মরশুমে। লালচে রুক্ষ্ম মাটি আর সবুজ অরণ্যের টানে। তার মাঝে ছড়িয়ে থাকা নিকোনো আদিবাসী কুটির কী পরম মমতাময়। দূরান্তে পাহাড়ের আভাষ আর শীর্ণকায়া নদী-ঝর্ণা মন উদাস করে। রেলপথে একটু এগিয়ে গিধনি, ঘাটশিলা এবং

গালুডি। ঝাড়গ্রাম থেকে সড়কপথে ৪৫ কিমি দূরে বেলপাহাড়ি যেখান থেকে যাওয়া যায় ২৬ কিমি দূরের ঝিলিমিলি কিংবা ২৮ কিমি দূরের কাঁকড়াঝোর অরণ্য-প্রবাসে। বেলপাহাড়ি থেকে ঘাঘরা হয়ে তারাফেনি বাঁধ দেখতে যাওয়া যায়। তারপর শিলদা-বিনপুর-দহিজুড়ি হয়ে আবার ঝাড়গ্রামে ফিরে আসা যায় গাড়িতে।

ঝাড়গ্রামের নিচু প-াটফর্মে পা রাখছি যখন, তখনও আকাশের মুখভার। রোদের দেখা নেই। ভেজা মাটি আর জলকাদা বিমর্ষ করে তুলল। বাইরে পাকা বাড়ি, দোকানপাট, বাস-জিপ-অটো-রিক্সার জটলা।

বিপ্রদাসের ছাত্র অর্ণব গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে তুলল ওদের শাল-মহুয়া গেস্টহাউস। স্টেশন থেকে সামান্য দূরে। সুভাষ পার্ক পেরিয়ে বাঁহাতে ঘুরে লোধাশুলি-ঝাড়গ্রাম পিচ-রাস্তায় এগোতে হবে। কলেজ মোড়ের একটু আগে বাঁহাতে ঘুরে কয়েক কদম এগিয়ে গেস্টহাউস। অন্যান্য থাকার জায়গাও অনেক আছে।

দোতলা বাড়ি। সামনে বাগান, ঘাষ, সবুজ গাছপালা, ফুলের আয়োজন। দুটো দেবদারু, একটি ঝুরি গাছ। বাড়ি দেখে সকলের মন ভালো হয়ে গেল। বিপ্রদাস তো বলেই উঠল – বাহ, বেশ সুন্দর জায়গা।

গৌতম একটা গাছ দেখিয়ে বলল – এর নাম স্বর্ণচাঁপা।

বাগানের মধ্য দিয়ে ভিতরে যাওয়ার পথ। সামনে এনট্রান্স লবি। ডানপাশে ড্রাইভ-ওয়ে। একেবারে পিছন দিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। খানিকটা জমি ছেড়ে রান্নাঘর। বাড়িটা উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়াও দেওয়া হয়। দোতলায় চারখানা কামরা বরাদ্দ হল আমাদের চার পরিবারের জন্য। অ্যাটাচড বাথরুম আছে। গরমজলের যন্ত্র নেই, তবে গরমজল সরবরাহ থাকবে। উপরি উপহার পাওয়া গেল একখন্ড টিরেস। ঘরের বাইরে পা ফেলতে-না-ফেলতেই উদার নভোতলে মুক্ত ছাদে পদচারণা করতে পারার মেজাজ আছে। নেমে যাওয়া যায় বাড়ির সামনের দিকে লবির মাথায় আরেক খণ্ড নিচু ছাদে। এই খোলা আকাশ, সবুজের ছোঁয়া, শান্ত স্নিগ্ধ বাতাস মুহূর্তের মধ্যে সকলকে আপ-ুত করল। অবসর কাটানোর নিটোল ছন্দ জমে গেল যেন।

অর্ণবের বাবা-মা প্রণব বারিক ও ভক্তি বারিক। দুজনে সমাজসেবার কাজে নিবেদিত প্রাণ। সংগঠনের নাম 'উইমেন ইন সোশাল অ্যাকশন'। গত বিশ বছর ধরে নারী কল্যাণের উদ্দেশে নানা কাজকর্ম নিয়ে মেতে আছেন। ঝাড়গ্রামে স্থাপন করেছেন একমাত্র ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল – 'ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল'। আমাদের আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য এই স্কুলের বাৎসরিক উৎসবে যোগদান – স্বাতী, বিপ্রদাস এবং জগদীন্দ্রবাবু

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এসেছেন। বিশেষ করে স্বাতী বহুল-প্রচারিত পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত(সম্পাদিকা বলে তার বিশেষ ভূমিকা আছে। আমরা অবশিষ্ট কয়েকজনা নিতান্ত সুযোগ-সন্ধানী – এই ফাঁকে একটু বেরানোর লোভ বর্জন না-করতে-পারার দলে।

গেস্টহাউসে খোকন নামের ছেলেটি কার্যত কেয়ারটেকার। কথা না বলে চুপচাপ কাজ করে যায়। কৃষ(া উত্তরা হাসিমুখে রান্নাঘর সামলায়। একটু পরে প্রণববাবু এলেন পরিচয় ও তদারক করতে। স্নানাহারের বন্দোবস্ত ঠিকঠিক হচ্ছে কিনা দেখতে। তার কাছে সোস্যাল আকেশন সংগঠনটির কাজকর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক বিবরণ পাওয়া গেল। আগামীকাল থেকে তিনদিন ধরে স্কুলের বাৎসরিক উৎসব শুরু হচ্ছে। আজ বিশ্রাম এবং কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন। উনিই গাড়ির ব্যবস্থা করবেন। আগামীকালের উদ্বোধনে আমাদের তিন অতিথির উপস্থিতি প্রয়োজন। এবং একজন নৃত্যশিল্পীর। ঘোরাঘুরির জন্য সারা দিনটা অবশ্য হাতেই থাকছে।

ইতিমধ্যে মেঘ কেটে রোদ উঠেছে। সেই সঙ্গে সকলের মুখে হাসি। চা এসে গেল। একটু পরে ব্রেকফাস্ট। চাঙা হয়ে বিপ্রদাসের প্রস্তাব – চলুন, একটু ঘুরে দেখা যাক জায়গাটা কেমন।

প্রফেসাররা বেরোলেন না। বাকি সকলে একপায়ে খাঁড়া। রেলস্টেশনের কাছে কৃষ(নগরে বনবিভাগের ডিয়ার পার্ক আছে। বনবিতানের জালে-ঘেরা টুকরো স্বাধীনতায় ঘুরে বেড়ায় চিতল হরিণ। চিড়িয়াখানায় আছে – ভালুক, শিয়াল, বনবিড়াল, বনমোরগ, ময়ূর, এবং নানা রকমের পাখপাখালি। ডিয়ার পার্কের জন্য পা বাড়াতে কেউ উৎসাহিত নয়। রাধানগরে রয়েছে বিশাল কেচন্দা বাঁধ ও মেলা বাঁধ।

গৌতমের বাবা একদা এখানে কোন এক জায়গায় থাকতেন। জায়গার নাম গোবরডাঙা হবে। তার হদিশ কেউ দিতে পারল না। তবে ও ঠিক করে রেখেছে একবার খুঁজতে যেতে হবে সেই ফেলে-আসা স্মৃতি।

এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। ডানহাতে এগিয়ে দেখি একজায়গায় প্রদর্শনীর আয়োজন চলছে। শু(হবে বিকেলে। লাল মোরাম মাখা পথের দুপাশে বেশ কয়েকটি স্থাপত্য সাজানো। কোনটি প্রাচীন মিশরীয় রীতিতে তৈরি, কোনটি কাঠের-টুকরো-দিয়ে-সাজানো। স্থাপত্য গড়া হয়েছে বাতিল-দ্রব্যাদি দিয়ে। বাড়ির ভিতরকার অঙ্গনেও নানা মূর্তি ও কা(কৃতি। বেশ চমৎকার কাজকর্ম তো। আসলে এটি কলাবিদ্যা শেখার একটি কেন্দ্র। বেশ কিছু স্টল তখনও ফাঁকা। ঠিক হল বিকেলে দেখতে আসা যাবে।

রান্নার দেরি আছে খবর পেয়ে ভাবা হল – একবার শ্রীমতী ভকিত বারিকের বাড়ি ঘুরে আসা যেতে পারে। সদলবলে হানা দেওয়া হল সেখানে। গল্পগুজব হল একটু অর্ণবের পড়ার ঘরে বসে।

ফেরার সময় শ্রীমতী বারিক আমাদের নিয়ে ঢুকলেন পাশের বাড়িতে। কর্তা অসীম দাসের গাছপালার শখ। এখানকার পলিটেকনিকের মাস্টারমশাই। সহধর্মিনী বাসন্তী দাসের ভরসায় সুন্দর বাগান গড়ে তুলেছেন একফালি জমিতে। চৌকো ছোট্ট ফোয়ারার মধ্যে শালুক ফুটেছে। গোলাপ-ডালিয়া-জিনিয়া জাতীয় শীতের ফুল অনেক। রয়েছে পাতিলেবু ও বাতাবি-লেবুর গাছ। মৌমাছি পালনও করছেন। আকণ্ঠ ভালোবাসায় ছেলের নাম রেখেছেন অরণ্য।

দুপুরে আহারাদির পরে গেলাম ভ্যান গাড়িতে চেপে কনকদুর্গা মন্দির দেখতে। আড়াইশ' বছরের প্রাচীন মন্দির। ১৩ কিমি দূরের জামবনী ছাড়িয়ে আরো ৫ কিমি দূরে চিল্কিগড়। মন্দির চিল্কিগড়ে। ভকিত দেবী আমাদের সঙ্গে রইলেন দুজন সংগঠন-কর্মী নিয়ে। দুজনের মধ্যে একজন প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর রোমি মজুমদার।

দুপাশে শালবন আর মাঝখানে মসৃণ পিচ ঢালা পথ। কিছুদূর পরে পথ আর মসৃণ রইল না। যাওয়ার পথে পড়ল দুটি বিখ্যাত তেঁতুলগাছ। সেখানে শামুকখোলা পাখিরা প্রতি বছর এসে ডিম পাড়ে, বাচ্চা ফোটায়, তারপর তাদের নিয়ে উড়ে চলে যায় কোন দেশে কে জানে! তাদের আগমনে খুশি হয়ে ওঠে স্থানীয় মানুষেরা। আশায় বুক বাঁধে, বৃষ্টি নামবে এবার। বৃদ্ধ যতীন্দ্র মাহাতো বন্দুক হাতে সারা রাত ধরে সেই সব অচিনদেশের পাখিদের পাহারা দেয়। গ্রামের মানুষ ভকিতভরে পূজোও করে নাকি।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কনকদুর্গা মন্দির। দুটি মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনটি বাতিল। অন্যটি আধুনিক। এখানেই প্রতিষ্ঠিত দেবী নিত্যপূজা পাচ্ছেন। ইনি অ(ারূঢ়া, ত্রিনয়না ও চতুর্ভুজা। অষ্টধাতুর দেবীমূর্তি চণ্ডীর লোকায়ত রূপে পূজিতা হচ্ছেন। রানি গোবিন্দমণির হাতের কঙ্কণ দ্বারা দেবীমূর্তি নির্মিত হয়েছে। উপরের বাঁহাতে পানপাত্র এবং নিচের হাতে লাগাম। উপরের ডানহাতে খড়্গ এবং নিচের হাতে বরাভয় মুদ্রা। দেবীর এই অদ্ভুত রূপটি নাকি স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত। রূপকার ধাতুশিল্পি যোগী কামিল্যা। বর্তমান পুরোহিতের নাম আতঙ্ক ভঞ্জন ষড়ঙ্গী।

পূজোর প্রসাদও অন্য রকমের – পরমান্ন, অন্নভোগ ও মৎস্য। সপ্তাহে দুদিন খিঁচুড়ি প্রসাদ মেলে।

ভকিতদেবী আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন যে মন্দিরে হনুমানের উৎপাত খুব। চারদিকের জঙ্গলে শ'পাঁচেক হনুমান আছে। কদিন আগে এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের হাত থেকে পলিথিন ব্যাগে রাখা পূজোর প্রসাদ কেড়ে নিয়ে গাছে চড়ে বসেছিল এক বেয়াদপ হনুমান। সঙ্গের শান্ত্রীমশাই বন্দুক ঠুকে হনুমানের দিকে তাক করতেই সুড়সুড় করে নেমে এসে প্রসাদ ফেরত দিয়ে গিয়েছিল সেই হনুমানটি। একেই বলে শক্তের ভক্ত। বানরেও তা বোঝে।

আধুনিক মন্দিরটি ১৯৩৭ সালে নির্মিত। বাংলা ৯ই পৌষ, ১৩৪৪ সন। দখিণমুখী রেখ শ্রেণির মন্দিরটি উড়িষ্যা রীতিতে নির্মিত হলেও দূর থেকে গীর্জার মতো শিখর মনে হয়। সামনে দোচালা জগমোহন, তার মধ্যে হোমকুণ্ড এবং বলিস্থান রয়েছে। পিছনে গর্ভগৃহ এবং প্রদ(িণ পথ। দুধাপে হ্রাস পেয়ে শিখরে মিশেছে। অতীতে এখানে নরবলি পর্যন্ত হত। বর্তমানে পশুবলি হয়।

ধলভূম রাজবংশের শাখা চিল্কিগড়ের রাজারা। বর্তমান রাজার নাম জগদীশচন্দ্র ধবলদেব। রাজবংশের ইতিহাস যা জানা যায় তা এই রকম। মধ্যপ্রদেশের নর্মদা তীরের ধারা নগরীতে প্রমার (পরমার?) কুলের সূর্যবংশীয় রাজা ছিলেন রামচন্দ্রসিংহ। তার পুত্র বীরসিংহের এক পুত্র পৈতৃক সিংহাসনে আসীন হলে, অন্যপুত্র জগৎদেও সিংহ ১৩শ শতকের প্রথমভাগে ইষ্টদেবতা রঙ্কিনী দেবী এবং কুলপুরোহিত বামদেব ওঝার পুত্রকে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণ ঝাড়খণ্ডে আসেন। তখন ধলভূমের রাজা ছিলেন রজক সম্প্রদায়ের জনৈক ধবলদেব। তার সঙ্গে জগৎদেওর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ধবলদেবকে পরাস্ত করে জগৎদেও সিংহ রাজ্যের অধীশ্বর হন। নিহত ধবলদেবের রানি সহমৃতা হওয়ার পূর্বে বিজয়ী রাজাকে অনুরোধ করেন, ধবলদেব উপাধি গ্রহণ করে কুলমর্যাদা অ(ুন্ন রাখতে। জগৎদেও সে অনুরোধ রাখলেন এবং পরিচিত হলেন জগন্নাথদেও ধবলদেব নামে।

উত্তরকালে জামবনির রাজা হয়েছিলেন কমলাকান্ত ধবলদেব। ইনি সপ্তম জগন্নাথদেও ধবলদেবের (ডাকনাম কিনুধল) তৃতীয়া রানি সুবর্ণমণির গর্ভস্থ সন্তান।

আধুনিক মন্দিরের বাঁপাশে বাংলার বিশিষ্ট শিল্পরীতিতে গড়া প্রাচীন পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দিরের ঢালু চালাছাদের উপরতলে চারকোণায় এবং কেন্দ্রস্থলে রত্নমন্দির থাকার জন্য এটি পঞ্চরত্ন হিসেব গণ্য। মন্দিরটি পূর্বমুখী ও ইঁটের তৈরী। হাতখানেক উঁচুতে অধিষ্ঠান। সামনে চক্রাকার খিলানযুক্ত(প্রবেশপথ। দুদিকে পোড়ামাটির দ্বারপাল মূর্তি। মন্দিরগাত্রে এবং শিখরদেশে মিথুন মূর্তি ছিল। রিলিফের কাজ কালের প্রবাহে

বিনষ্ট হয়েছে। মন্দির এখন পরিত্যক্ত, অতীতদিনের নির্বাক দ্রষ্টামাত্র। তবে সংস্কার না করলে এর বিদায়ও আসন্ন।

পঞ্চরত্ন মন্দিরের পাশ দিয়ে বনের পথে নেমে যেতে হয় ডুলুং নদী দেখতে। দীর্ঘকায় বনরাজির শাখা-প্রশাখার সবুজ আড়ালে সূর্যের আলো স্পর্শ করতে পারে না লালমাটির বুক। আঁকাবাঁকা বনপথ ধরে যেতে যেতে পৌঁছে যাই বালুকাময় নদীতটে। কয়েকটি দল পিকনিক করছে। ওদিকে উঁচু পাড়। বড়ো বড়ো শিলাখণ্ড ছড়ানো। পশ্চিমতীরে একদা রাজা কমলাকান্তর রাজপ্রাসাদ ছিল। ধলভূম রাজার প্রাসাদ। বর্তমানে অবশেষ বলেও কিছু নেই। জামবনির উত্তরে দিগল পাহাড়। তার পশ্চিমে শিলদার পাহাড় থেকে ডুলুং নদী উৎপন্ন হয়েছে। ৬০ কিমি এঁকেবেঁকে বইতে বইতে মিলিত হয়েছে সুবর্ণরেখার সঙ্গে। মেদিনীপুরের সাঁকরাইলের কাছে রোহিনী গ্রামে।

দেবীদর্শন করে লোধাবসতি দেখতে পানুয়ানালা গ্রামে যাওয়া হল।

উচ্চকোটির সমাজে লোধাসম্প্রদায় চোর হিসেবে খ্যাত হয়ে রয়েছে। চুরিচামারি লুঠপাট ডাকাতি এদের বর্তমান জীবিকা। আসলে এরা ছিল অরণ্য-নির্ভর উপজাতি। শিকার এবং অরণ্য থেকে খাদ্য-উপরকণ সংগ্রহ করে জীবনধারণ করত। হান্টার-গ্যাদারার যাদের বলে আর কী। বর্তমানে সরকার অরণ্যের অধিকার নিয়েছে। ফলে এরা জীবনধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। এদিকে অন্য উপজাতির মতো কৃষিকাজ-পশুপালন শেখেনি। একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম যে এদের নাকি কৃষিকাজ বা পশুপালন ইত্যাদি শেখালেও শিখতে চায় না। আসলে ঐ সব পেশায় ওরা মন লাগাতে পারে না। অনতিকাল পরেই চুরি-ডাকাতির মতো কুকর্মে ফিরে আসে। তফসীলভুক্ত উপজাতি লোধাদের খেরিয়া নামেও পরিচিতি আছে।

উপজাতি কে? যাদের উপজাতি হতে জন্ম, আদিম জীবনযাত্রা, দুরধিগম্য স্থানে বসবাস এবং অনুন্নত অবস্থায় জীবনযাপন, তারাই উপজাতি। পশ্চিমবঙ্গে এমন ৪১টি উপজাতি আছে। তাদের মধ্যে প্রধান হল সাঁওতাল, মুণ্ডা এবং ওঁরাও। তারপরেই ভূমিজ, কোরা ও লোধাদের স্থান। লোধা জনসংখ্যা ৪১ হাজারের মতো। এমনিতে আদিবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২ শতাংশও নয়। তারা ছড়িয়ে আছে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায়। সাধারণভাবে বনবাসী আদিবাসীরা শালপাতা-কেন্দুপাতা-কাঠকুঠো সংগ্রহ, বাবুই ঘাষের দড়ি বানানো, মজুর খাটা ইত্যাদি করেই জীবন ধারণ করছে।

বেশ লাগছিল এই সব গ্রাম্য কুটির, গাছপালা দেখে ভাঙা রাস্তার দুলুনি খেতে খেতে পথ চলতে। মধুলীনার কাছে সবই 'দা(ণ, না?' প্রফেসরের ছেলেটির নাম অতনু। ঠাণ্ডা স্বভাবের। তার মাও কমকথার মানুষ। চুপচাপ থাকলেও উপভোগ করছিলেন অরণ্য-বিহার।

বাঁশবনের পাশ দিয়ে পথ এগোচ্ছে। মাটির বাড়ি। সাঁওতালদের মতো নিকোনো ঝকঝকে তকতকে নয়। মালিন্য মাখা। দাওয়ায় বসে উঠোনে পা ছড়িয়ে শালপাতা সেলাই করছে মেয়েরা। কাঠপাতা জ্বালিয়ে রান্না হচ্ছে মাটির হাড়িতে। বাচ্চারা খেলছে। ছেলেরা ছোট ছোট দলে ভিড় জমিয়েছে। গায়ে ময়লা জামা আর সুতির এক টুকরো কাপড় শরীরে জড়িয়ে গলার কাছে গিঁটবাঁধা। এইটুকু মাত্র শীতের সম্বল নিয়ে এরা হাসিমুখে ভিড় করেছে আমাদের চারপাশে। গ(-মুরগী চড়ে বেড়াচ্ছে। জঙ্গল থেকে ঘরে ফিরে এসেছে সকলে।

নারীসমাজ নিয়ে স্বাতীর বিশেষ ভাবনা ও কাজকর্ম দেশেবিদেশে ব্যাপ্ত। তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশে ও কথা বলছিল স্রোতা নায়েক নামের আদিবাসী একটি মেয়ের সঙ্গে। স্রোতা – কী মিষ্টি নাম। এরকম একটা নাম ওরা পেল কি করে! জানা গেল দিদিরা দিয়েছে। দিদি মানে সমাজসেবিকা কর্মীরা। সপ্রতিভ মেয়েটি স্বাতীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিল খাটের কোণায় বসে। বিবাহিত। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছে। বাড়িতে মুদির দোকান দিয়েছে। হিসেবপত্র রাখতে জানে।

অদূরে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে মেঠো পথের ধার ঘেষে রয়েছে সরু নালা। জলপ্রবাহ নেই। নালা পেরিয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরতে বেরোল কয়েকজন। বাঁশবনের পাশ দিয়ে, মহুয়া গাছের গন্ধ শুঁকে, সাদাটে প্রান্তরের শীত গায়ে মেখে। এদিকটায় মাহাতোদের গ্রাম। এরা আবার লোধাদের তুলনায় উচ্চবর্ণ। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও আবার এতটা ভেদাভেদ থাকতে পারে, তা জানা ছিলনা।

স্বাতী-মধুলীনারা অনুরোধ করল স্রোতাদের নাচ দেখাতে, গান শোনাতে। প্রস্তুতি নেই – লাজুক হাসিতে জানিয়ে দিল তিনটি মেয়ে। ভকিতদেবী এবং তার সংগঠনের মেয়েরাও বলল অনেক করে। অনেক অনুরোধের পরে চারটি মেয়ে আমাদের পুষ্টির (নাকি খিদের ?) গান শোনাল – 'খিদে যখন পায়, খাবার খেতে হয়, ...।' তারপর মনসামঙ্গলের গানও গাইল।

কথা বলছিলাম স্থানীয় লোধা যুবক রাম মল্লিকের সঙ্গে। গ্রামের আরেক পাশে যে মাহাতোরা রয়েছে তারা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের। লোধা-সাঁওতাল সম্প্রদায়ে বৈবাহিক

সম্পর্ক হয় না। এদের পদবী 'নায়েক' 'মল্লিক' এরকম কেন? এসব কি আদিবাসী পদবী নাকি হিন্দুজাতির মর্যাদায় উঠতে চায় বলে হিন্দু পদবী গ্রহণ? এক যুবককে তাদের গ্রাম ঘুরিয়ে দেখাতে বলা হয়েছিল। সে বলল – কি দিখাব আমাদের গ্রাম? দিন চইলছে না আমাদের। কুন রকমে বেঁইচে আছি।

ভকিতদেবী জানালেন – শহুরে অতিথি এলে এরা আশা করে বোধহয় এদের জন্য কিছু জিনিস নিয়েটিয়ে এসেছে।

মেদিনীপুরের এদিকটায় এখন হাতির উপদ্রব খুব হচ্ছে। দলমা থেকে হাতির দল এসে গ্রামে চড়াও হচ্ছে। ঘরে ঢুকে ধান-মহুয়া খেয়ে যাচ্ছে। গাছ থেকে আম পেড়ে খাচ্ছে। ঘরদোর ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে। মাঠের ফসল নষ্ট করছে। এই তো সেদিন মহুয়া পান করে পুকুরের জলে দাপিয়ে বেরিয়েছে সারারাত ধরে। হুলা পার্টি রাত জেগে মশাল জ্বালিয়ে পটকা ফাটিয়ে হাতির দল তাড়ানোর চেষ্টা করছে। হাতির তাণ্ডব থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে শুনেছি এদিকে কোথাও হাতিমাতার পূজোও চালু হয়ে গিয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের লাগোয়া আদিবাসী-প্রধান অঞ্চলে মাওবাদী কমুনিস্ট সেন্টার বা জনযুদ্ধের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে পুলিশের ধরপাকড় যা সাধারণভাবে অত্যাচারে পর্যবসিত হয়। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা পর্যন্ত পৌষের শীত জঙ্গলে লুকিয়ে রাত কাটাতে বাধ্য হয়। এ অভিযোগ গ্রামবাসীদের। মনে হল এদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে জনযুদ্ধ দলের প্রতি।

ক্রমশ অন্ধকার ঘন হচ্ছে। এবার গাড়ি ফেরার পথ ধরল। এরকম গ্রাম্য পরিবেশে অন্তত একটা গোটা দিন কাটাতে পারলে ভালো হত। পশ্চাৎপদ মানুষের কথা পড়েছি-শুনেছি। এমনকরে চোখে দেখা হয়েছে কম। সে হিসেবে এক নতুনরকমের চেনাজানা হল।

গেস্টহাউসে ফিরে এসে চা খেয়ে গেলাম সকালের না-দেখা প্রদর্শনীটি দেখতে। ওরা প্রদর্শনীর নাম রেখেছে 'রঙ মাটি মানুষ'। রঙ-তুলির কাজ এবং ভাস্কর্য ছাড়াও স্টলে রয়েছে পোড়ামাটির কাজ, ধাতুর ডোগরা শিল্প। বাড়ির ভিতরে রামকিঙ্কর মঞ্চে স্কুলের ছেলেমেয়েদের আঁকার প্রদর্শনী বসেছে। বাইরের নন্দলাল মঞ্চে আলোচনা সভার আয়োজন।

দিনটা ভালোই কাটল। রাতে ঘরে ফিরে তোফা এক ভোজনপর্ব। উত্তরার হাতে রান্নাটা দা(ণ। অনেক রাত পর্যন্ত মুক্ত আকাশের নিচে বসে-হেঁটে-চলে গল্পগুজব

করে এলিয়ে থাকা গেল। স্বাতীর গান শোনা হল। পৃথিবী এখন ভয়ানক শান্ত ও নরম। ইরাকের যুদ্ধ শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না। সাদ্দাম ধরা পড়েছে, তবু না। গৌতমের গোবরডাঙারও হদিশ মিলল না এখনো।

২।

পরদিন সোমবার – সকালে বিপ্রদাস ঘুম ভাঙাল।

ভারতীকে সঙ্গে তিনজনে পায়ে হেঁটে ঘুরে এলাম সাবিত্রী মন্দির। মন্দিরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। সাড়ে দশটায় খুলবে। মন্দিরের আবার অফিস-টাইম? শুনেছি এই মন্দির সবিতা দাসী নামের এক মানবকন্যার। মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই মানবীর দেবীত্বে উত্তরণের কথা। সে কাহিনী জানা হল না। মন্দিরে ঐ মানবী তথা দেবীর কেশ ও খড়্গ পেটিকায় সযত্নে রাখা আছে এবং পূজিত হচ্ছে। তাহলে মন্দিরের নাম সাবিত্রী কেন?

ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ি অনতিদূরে। পরে দেখা হবে। ফেরার পথে দেখা হল স্বাতী-পাপ্পুর সঙ্গে। ওরা তখন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে। পাপ্পুর ভালো নাম বর্ণিল, মাধ্যমিক দেবে। বড়ো হয়ে ও মাকে নিয়ে চলে যাবে দূর প্রবাসে, হয়তো মার্কিন মুলুকে। বাবা তখন একা থাকবে কিছুদিন। পড়াশোনা শেষ করে কর্মজগতে প্রতিষ্ঠিত হলে মাকে পাঠিয়ে দেবে বাবার কাছে। মা যেমন তার শাবক আঁকড়ে থাকে, শাবকটিও জড়িয়ে থাকে মাকে।

স্বাতী-পাপ্পুকে দেখিয়ে ভারতী সেকথা মনে করিয়ে দিল পথের ধারে এক দোকানে চা-পান করতে করতে। বিপ্রদাস নিজের দুর্গতির কথা ভেবেই বোধ হয় শুধু হাসল। ঘরের বাইরে চিনি-বর্জিত লিকার চা পাওয়া এক সমস্যা।

বাড়ি ফিরে ব্রেকফাস্ট সেরে সকলে মিলে গেলাম কলাবনি। ভকিত দেবীর গাড়িতে। ওখানে বিশ বিঘার ওপর জমিতে রয়েছে এদেরই ল্যাবরেটরিসহ স্কুলবাড়ি। বর্তমানে পরিত্যক্ত। রয়েছে ট্রেনিং সেন্টার। এখানে টালি তৈরী হয়। সুতো কাটা, বোনা, মাটির পাত্র নির্মাণ ইত্যাদি কাজকর্ম হাতেনাতে শেখানো হয় আদিবাসী ছেলেমেয়েদের। আমাদের সঙ্গে ছিল আরেকজন সমাজসেবী অধ্যাপক পুলক লাহিড়ি। ইনিও বারিকবাবুদের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। পৃথক আরেকটি এন-জি-ও সংস্থা

আছে তার। জেনে খুব ভালো লাগল। আমার একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে সম্ভব হলে সকল লেখাপড়া-জানা মানুষের কোন-না-কোন সমাজসেবার সঙ্গে জড়িত থাকা উচিত।

ট্রেনিং সেন্টারে ঘুরতে ঘুরতে আলাপ হল কর্মি মুর্মু নামের মেয়েটির সঙ্গে। সপ্রতিভ মেয়েটিকে আমাদের ভালো লাগল। এরকম ছেলেমেয়েরা উঠে এলেই এদের সমাজ জেগে উঠবে। আমাদের ঘুরেফিরে দেখাচ্ছিল সব্যসাচী ভট্টাচার্য। সদ্য যোগ দিয়েছে সংস্থায়। তার স্ত্রীর নামও স্বাতী ভট্টাচার্য। কম্পুটার নিয়ে আছে সোশাল অ্যাকশন সংস্থার সঙ্গে।

ট্রেনিং সেন্টারে কাজ হচ্ছিল তাঁত বোনার। দুটি ছেলে তাঁত বুনছিল। একজনকে তাঁত বোনা শিখানো হচ্ছিল। দুটি মেয়ে চরকা ঘুরিয়ে মাকুতে সুতো গুটোচ্ছে। টালি বানানোর কাজকর্ম এখন আর হচ্ছে না। মাটির কাজও নয়। অর্থাভাবেই হচ্ছে না। স্কুল বিল্ডিং রয়েছে – কিন্তু স্কুল তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঝাড়গ্রামে। ফলে এতটা তৈরী ইনফ্রাস্ট্রাকচার অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে।

পুলকবাবু বলছিলেন – এখানকার মানুষজনের দুরবস্থা দেখলে নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হয়।

ভদ্রলোকের একথাটা দাগ কেটে গেল আমাদের মনে। সত্যিই তাই। তবু তো উনি এবং ওনাদের মতো কিছু মানুষ ছুটে ছুটে এসে কিছু করার চেষ্টা করছেন। আমরা অধিকাংশ নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। মানুষ কীসের লোভে শহরবাস করেও ঝকঝকে তকতকে জীবনযাপন ত্যাগ করে আদিবাসী ও নিচুতলার মানুষের জন্য কাজ করে?

পুলকবাবু চলে গেলেন তার কাজে। খানিকটা দূরে তার বাড়ি। হাতির দল আমগাছ থেকে আম পেড়ে খেয়ে গিয়েছে কদিন আগে। এ কথা শুনে পাপ্পু-মধুলীনারা আপশোষ করতে বসল। উহ্, তখন যদি ওখানে থাকা যেত তবে হাতিদের আম পেড়ে খাওয়া দেখা যেত বেশ।

এরপর গেলাম জঙ্গলমহলে – অজয় ঘোষালের বাগান দেখতে। বিশ বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন তিনি শখের বাগান। কোলকাতা থেকে বুক করে এলে এখানে থাকার জায়গা মেলে। ফুল, গাছপালা, শান্ত নির্জনতা এখানকার অমূল্য সম্পদ। দুচারটে প্রাণীও আছে। বর্তমানে অযত্ন-লালিত। প্রবেশমূল্য তিন টাকা করে। ক্যামেরার জন্য দশ টাকা দিতে হবে। পাপ্পু বেঝাতে চেষ্টা করছিল - ক্যামেরাম্যানের জন্য আলাদা তিন টাকার টিকিট কাটতে হবে না। ওর ওজনদার যুক্তিটা প্রহরী হেসে উড়িয়ে দিল।

বাড়ি ফেরার পথে আমাদের শহুরে সখ উঠল অরণ্যে পদচারণা করার। গাড়ি থামিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়া হল শাল-মহুয়ার জঙ্গলে। স্রেফ খানিকটা আবেগ উস্কে বন্য প্রান্তরে পদচিহ্(আঁকা। গৌতম ঘোষের 'আবার অরণ্যে' অনুপ্রাণীত হয়ে। এখানে চুপ করে নীরবতার রোদ গায়ে মাখতে হয়, মগ্ন হতে হয় নিজস্ব অতলে। পরিবর্তে বিস্তীর্ণ নির্জনতায় ঝরাপাতা মাড়িয়ে শহুরে কলকলানি ছড়িয়ে দিলাম। আমাদের সৌভাগ্য স্বাতী 'গলাটা ভীষণ খারাপ' এরকম অজুহাতটা বিশেষ শোনায় না। গান গাইল দরাজ কণ্ঠে পাখপাখালির জলসাঘরে।

এরপর গাড়ি নিয়ে চলল রাজবাড়ি দেখাতে। সিংহ-লাঞ্ছিত প্রবেশদ্বার পেরোলে বিস্তীর্ণ উঠোন, ফুলের বাগান, ফোয়ারা। চকমিলানো রাজবাড়িতে রাজ পরিবার দোতলায় বসবাস করেন। পাশে ৩১ শয্যার হোটেল বসেছে একতলায়। রাজপরিবারের জন্য মন্দির রয়েছে বাঁপাশে।

বিকেলে ওয়েস্টএন্ড স্কুলের ফাংশান ছিল। ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন বিভাগের তরফ থেকে প্রদর্শনী করছে। প্রফেসর জগদীন্দ্র মণ্ডল, সাংবাদিক স্বাতী ভট্টাচার্য এবং বিশিষ্ট মাস্টারমশাই বিপ্রদাস ভট্টাচার্য আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ভাষণ দিয়েছে। তিনজন তিন দৃষ্টিকোন থেকে সুন্দর বক্তব্য রেখেছে।

আমন্ত্রিত অঞ্চলপ্রধান হীরামণি মাণ্ডি আইচিকি ভাষায় দুচার কথা বলল। এরপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিবিধ অনুষ্ঠান হল। কয়েকজন আদিবাসী মেয়ে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল বারান্দার এক কোণে। ভীরু চোখে বিপন্ন বিস্ময়। ফাঁকা চেয়ারে এরা বসতে পর্যন্ত সাহস করছে না। জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সারাটা সময়।

অনুষ্ঠানের মাঝখানে মধুলীনা দুটি চমৎকার নৃত্য পরিবেশন করে সকলের বাহবা কুড়োল। লোপমুদ্রার দুটি গান 'যমুনাবতী সরস্বতী' এবং 'মনে পড়ে সেই সুপুরীগাছের কথা'র ছন্দে।

এরই ফাঁকে স্বাতী হীরামণির সঙ্গে বসে কথা বলছিল। জেনে বিস্মিত হতে হয় যে এই গ্রাম্য মেয়েটি ৩৫টি গ্রামে ঘুরে ঘুরে সাড়ে তিনশ' মেয়েদের সংগঠিত করেছে। দিদিদের সঙ্গে থাকতে থাকতে কথাবার্তায় চালাকচতুরও হয়েছে। নিজেই হাসতে হাসতে বলল – আমি ঠিক চেঁচামিচি কর্যে পঞ্চায়েত থিক্যে আমারটা আদায় করে লিই। বাবুরা তো বলে, উ বড়ো চেঁচায়, কি চাইছে, দিয়ে দে।

স্কুলের নির্ধারিত অনুষ্ঠান শেষ হলে হীরামণিরা আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন করল। মাথায় ময়ূরের লম্বা পালক গুঁজে ছেলেরা মাদল-ধামসা বাজাল, উদাস-করা বাঁশিতে

তুলল মিহিন তান। কালোবরণ মেয়েরা খোপায় ফুল গুঁজে, গলায় মালা পড়ে আর হাতে হাত রেখে দুলে দুলে পায়ের তালে ঘুরে ঘুরে নাচল। হীরামণি গান ধরল গলা ছেড়ে। মধুলীনার ইচ্ছে ছিল ওদের সঙ্গে পা মেলানোর। ওরা রাজি হল না। নাচতে হলে ঠিক ওদের মতো সাজতে হবে, তবেই ওরা দলে নেবে। একথা জানতে পেরে ভক্তিদেবী স্রোতাকে ডেকে কথা বলে মধুলীনাকে তুলে দিল স্টেজে। কোমরে শাড়ির আঁচল গুজে ও পা মেলাল দ্রিম দ্রিম ছন্দে। মাতাল মাদলের উদাসী ধ্বনিতে। সবশেষে সাঁওতাল ছেলেরা তীর-ধনুক নিয়ে শিকারের সাজে নাচল। কালো উদল গা, হাঁটুর ওপর মালকোচা মেরে পড়া ডুরে-কাটা কাপড়। রাজীব গান্ধির সঙ্গেও ওরা নাকি নেচেছিল এই নাচটা। গর্বভরে বলল – প্রাইজ জিতেছিলাম গো।

আদিবাসী নাচ দেখে অভিভূত সকলে। আমাদের কাছে এটাই সবথেকে মূল্যবান প্রাপ্তি। তবে এই নাচগান যদি সাজানো স্টেজে না হয়ে উদার আকাশের নিচে হত তবে আরো সুন্দর হত। হীরামণিকে ডেকে এমন সুন্দর একটি উপহারের জন্য ধন্যবাদ জানানো হল। বিপ্রদাস সকলের তরফ থেকে মিষ্টি খাওয়ার জন্য কিছু অর্থ হীরামণির হাতে তুলে দিল।

৩।

পরদিন সকালের প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে চলে গেলাম ঝাড়খণ্ডের পূর্ব-সিংভূম জেলার ঘাটশিলায়। গিধনি (১৫ কিমি), চাকুলিয়া, ধলভূমগড়, কোকপাড়া হয়ে ট্রেনে ৬০ কিমি পথ। ধলভূমগড়ে ধলরাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ১৭৬৭ সালে বৃটিশ শাসনের বি(দ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ধলভূমের রাজা। মেদিনীপুর-বাঁকুড়ায় চুয়ার বিদ্রোহ হয়েছিল ১৭৯৮-৯৯ নাগাদ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ(ণ জমিজমা ঘরবাড়ি জীবিকা হারিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষগুলো বিদ্রোহ করেছিল বলে তারা চোয়াড় আখ্যা পেয়েছিল। ধলভূম-রাজার বিদ্রোহ তারও আগেকার ঘটনা।

ঘাটশিলায় গেলে কথা-সহিত্যিক বিভূতিভূষণের বাড়ি দেখব আর সুবর্ণরেখার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় হবে, এই বাসনা ছিল মনে। কিছু দূরে রয়েছে জামশেদপুর, টাটানগর ও ডিমনা লেক। না, সেসব দেখতে যাব না। কাছাকাছি কি কি দেখার বস্তু আছে জানতে গিয়ে একগুচ্ছ ফিরিস্তি জুটল স্টেশন চত্বরের জনৈক ব্যক্তি(র কাছ থেকে। সবই গাড়ি নিয়ে দেখতে হবে, পায়ে হেঁটে নয়। চোখে পড়ল স্টেশনের

কাছেই রয়েছে পারফেক্ট ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস। তাদের মাধ্যমে কমাণ্ডার জিপ ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম। কলেজ রোড ধরে এগিয়ে জাতীয় সড়ক ডিঙিয়ে গ্রামের রাস্তায়। নিকোনো ঘরবাড়ি, মাঠ, খেতখামার, ঝোপঝাড়। ধুলোমাটি উড়ছে। তাও কী দা(ণ!

প্রথম দর্শনীয় স্থল ৯ কিমি দূরের বুরুডি লেক। তিনদিকে ধূম্র পাহাড় সবুজ গাছপালায় আবৃত। একদিকে মাটির বাঁধ দিয়ে জল ধারণ করে রাখা হয়েছে। লেকে জলবিহারের জন্য প্যাডল বোট আছে। দলবেধে উৎসাহীরা বনভোজনে এসেছে। বড়োদিনের ছুটির মরশুম চলছে আর পিকনিক হবে না! হাতে সময় থাকলে কোন একটি পাহাড়ে চড়া যেত। এখান থেকে তিনটি পাহাড় পেরিয়ে যেতে হয় আড়াই কিমি দূরের ধারাগিরি জলপ্রপাত দেখতে। পাহাড় জঙ্গল ও ঝোড়ার রোমাঞ্চ আছে সারা পথে। পুরোটা গাড়ি যায় না। খানিকটা হাঁটতে হয়।

ফিরে চললাম ৩৩ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশ ঘেঁষে যাওয়া ছোট্ট টিলা ফুলডুংরিতে। লালমাটি, কাঁকড় আর শাল-মহুয়ায় ঘেরা গাছপালায় শান্ত নির্জন পরিবেশ। চারদিকে ছড়িয়ে থাকা জনপদ দূরাগত ধ্বনির মতো মৃদু। শুনলাম বিভূতিভূষণ এখানে বসে লেখালেখি করতেন। একটু জিরিয়ে নেবার মতো সময় নেই হাতে। ঝটিকা সফরে বেরিয়েছি।

লাঞ্চের পর আমাদের গন্তব্য স্থল ছিল গালুডি। শুনেছিলুম খুব সুন্দর জায়গা। ঘাটশিলা থেকে দূরত্ব মাত্র ৮ কিমি। জিপের কোটরে মুখ লুকিয়ে ধুলো খেতে খেতে চলা। পথের দৃশ্য অধরা থেকে গেল। গাড়ি পৌঁছে দিল ব্যারেজে। সুবর্ণরেখার উপর ব্যারেজ। গোটা চৌদ্দ গেট আছে মনে হয়। সব গেটই তুলে রাখা হয়েছে। নদীতে জল সামান্যই। ব্যারেজ দেখে কে কী আনন্দ পেল জানিনা। আমার কাছে ফ্লপ-শো। ওই দেখা হল আর কী!

আবার ধুলো খেতে খেতে চললাম। এবার যাদুগোড়ার রঙ্কিনি দেবীর মন্দির দেখতে যাচ্ছি। ২৪ কিমি রাস্তা। যাদুগোড়া কি জন্য সংবাদের মধ্যে ছিল যেন? কপার আর ইউরেনিয়াম খনি আছে না এখানে?

যাদুগোড়া মোড় থেকে বাঁহাতে এগিয়ে রঙ্কিনী দেবীর মন্দির। পথের পাশে বাঁহাতে কালিমাতার আসন। একেবারে পাহাড়ের গায়ে। ইনি অনার্য উগ্ররূপিনী দেবী। রাস্তার বিপরীতদিকে গাছের শাখায় অজস্র প্রণাম, আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা জানিয়ে লাল কাপড়ের গিঁট বাঁধা। রঙ্কিনী দেবী এতদঞ্চলের অতি জাগ্রত দেবী। পাশেই

টিলা। তার উপর উঠে দাঁড়ালে চারপাশে পাহাড়, ঘন সবুজ অরণ্য, নিচের দিকে ঝর্ণার মতো জলধারা চোখে পড়ে। টিলায় রয়েছে রাধাকৃষে(র মন্দির।

যাদুগোড়া মোড় থেকে ফোন করে জানা হল যে ফেরার ট্রেন ইস্পাত একঘন্টা দেরিতে চলছে। হাতে যখন সময় আছে যাওয়া যাক নরওয়া পাহাড় ও নদী দেখতে। কিন্তু একেবারে অর্থহীন হয়ে গেল সেই ছুটে যাওয়া। আমরা পাহাড় অবধি যাইনি অবশ্য। গিয়েছি নরওয়া নদীর সেতু অবধি। পাহাড়টি অনতিদূরে।

নরওয়া সেতু দেখে ফিরতে ফিরতে সময় চলে গেল অনেকটা। ফলে ফেরার পথে সুন্দরী সুবর্ণরেখার তটভূমিতে নেমে দাঁড়ানোর মতো সময় আর রইল না।

সুবর্ণরেখার ঘাটে অজস্র শিলা থাকার জন্য এ জায়গার নাম হয়েছিল ঘাটশিলা। মোহন কুমারমঙ্গলম সেতুর উপর থেকে গাড়িতে বসে নদী দেখা হল। নদীতটে ছড়ানো শিলাখণ্ড দেখা হল। আর একরাশ অতৃপ্তি নিয়ে চলে যেতে হল। হয়তো ভালোই হল, সুবর্ণরেখার টানে আরেকবার আসা হবে।

চলতে চলতে গৌতম বলে উঠল – এই হল অপুর পথ।

অপু মানে দুচোখ ভরা অপার বিস্ময়, ভীরু পায়ে মানিয়ে চলার চেষ্টা ও আপামর বাঙালির কৈশোরস্মৃতি। অপুর পথ ধরে এগিয়ে অপুর স্রষ্টা বিভূতিভূষণের বাড়ি-দেখা এক চুমুক। বাড়ির সামনের স্মৃতিফলকে রয়েছে বিভূতিভূষণের জীবনকথা। এ বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে ১লা নভেম্বর, ১৯৫০ সালে। কিন্তু কী জীর্ণ দশা বাড়ির! দেখে কষ্ট লাগে।

তারপর আমরা রেলস্টেশনে ফিরে গেলাম। ঘোরাঘুরি করতে জিপের ভাড়া পড়ল ছশ' টাকা।

স্টেশনে এসে কপালে জুটল বিশাল ট্রেন বিভ্রাট। টাটার একটু আগে দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিকেলের ইস্পাত মোটেই লেটে চলছিল না, ঠিক চারটের সময় চলে গিয়েছে আমাদের হতাশ করে। এখন ঝাড়গ্রাম ফেরার উপায় সাতটা পনেরোর প্যাসেঞ্জার ধরা। আপ গীতাঞ্জলি প-াটফর্মে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কখন ছাড়বে নিশ্চয়তা নেই, আর তা নিয়ে তুমুল হৈ চৈ। সাতটা নাগাদ আচমকা পেয়ে গেলাম সকালের কুরলা এক্সপ্রেস। ঝাড়গ্রাম পৌঁছলাম যখন, তখন ওয়েস্টল্যাণ্ড স্কুলের অনুষ্ঠান শেষের দিকে। কয়েকজন গেল অনুষ্ঠান দেখতে।

ভক্তিদেবী আগের দিন বলেছিলেন ভালোমন্দ খাওয়াবেন। উত্তরার হাতে ফ্রায়েড রাইস নাকি ভালো উতরোয়। আমাদের গৌতমও একজন পুরষ্কার-প্রাপ্ত রন্ধনশিল্পি।

তা জেনে স্বাতীরা সাগ্রহে নিমন্ত্রণ প্রত্যাশা করল। সেদিন স্কুলের টিচার্সদেরও গেস্টহাউসে আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছিল।

স্বাতী শেষ মুহূর্তেও একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ইন্টারভ্যু নিল। প্রণববাবুকে আমি খানপাঁচেক বই উপহার দিলাম। বারিক পরিবারের চমৎকার আতিথেয়তার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানালাম। ভারতীর হাত দিয়ে ভক্তিদেবীর হাতে সামান্য অর্থ তুলে দেওয়া হল আরব্ধ সমাজকল্যাণের কাজে লাগানোর জন্য।

আবার আসার সদিচ্ছা নিয়ে আমরা পরদিন সকালে সাড়ে সাতটার স্টিল এক্সপ্রেস ধরলুম।

বেড়ানোটা দা(ণ হয়েছে। মধুলীনা-পাপ্পুর ভাষায় বলতে হয় – একেবারে ফাটাফাটি। ইতিমধ্যে গৌতম গোবরডাঙার খোঁজ পেয়েছে। জায়গার নামটা গোবরডাঙা নয়, বাছুরডোবা।

বর্ষশেষে তিনদিনের সুন্দর ভ্রমণের জন্য সাধুবাদ জানাতে হয় শতপর্ণীর উদ্যোক্তাদের।